নাইরোবিতে চার ঘন্টা

কাজী জহিরুল ইসলাম

অন্ধকারের আঁড়াল থেকে একটা ঠান্ডা বাতাশের ঝাপ্টা এসে কানের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। সাথে সাথে শরীরে হালকা কাঁপুনি অনুভব করলাম। প্লেন থেকে নামতে হলো রানওয়ের ওপর। এরপর হেঁটে হেঁটে এরাইভাল লাউঞ্জ। নাইরোবিতে ছয়ঘন্টার যাত্রাবিরতি। চুপচাপ এয়ারপোর্টে বসে না থেকে শহরে একটা চক্কর মারলে কেমন হয়? সোয়া ছয়টা বাজে। এখনো ভোরের আলো ফোটে নি। আকাশী রঙের লেইস্যাস প্যাসারটা (ইউএন পাসপোর্ট) বাড়িয়ে দিতেই সবে কুড়ি উত্তীর্ণ সাপের মতো ছিপছিপে এক কৃষ্ণ সুন্দরী, কেনিয়ান ইমিগ্রেশন অফিসার, একটি অভিনন্দনের হাসি উপহার দিল। খটাশ করে এলপিতে স্ট্যাম্প করেই বললো, ওয়েলকাম টু নাইরোবি। সবুজ পাসপোর্টের মালিক, একজন গর্বিত বাংলাদেশী, হিসাবে পৃথিবীর নানান দেশের বিমানবন্দরে অহেতুক হয়রানী হবার কম অভিজ্ঞতাতো আর জমা হয় নি ঝুলিতে। তাই এই কেনিয়ান সুন্দরীর উষ্ণ অভিনন্দনটুকু খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো। মনে হয় সময়টা ভালোই কাটবে।

ইকুয়েটরের ওপর শুয়ে থাকা চিরবসন্তের দেশ কেনিয়া। তাপমাত্রা সারাবছরই ১৮ থেকে ২২ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আরো একটি কারণে কেনিয়া বিশ্বখ্যাত, বন্যপ্রাণীর সবচেয়ে নিরাপদ অভয়ারণ্য বলে সারা বিশ্বে কেনিয়ার রয়েছে বিশেষ সুনাম। মাদাগাসকারের এক যুবক ইমিগ্রেশন পেরিয়েই সোজা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। 'আপনি কি ট্রানজিট প্যাসেন্জার?' প্রশ্নটা করেই তাকিয়ে আছে আমার চোখের দিকে, হাসি হাসি মুখ। আমি সম্মতিসূচক মাথা দোলাতেই ওর হালকা হাসির আভাসটি পুরো মুখে ছড়িয়ে পড়লো। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, চার্লস। আমিও। চলেন দু'জনে মিলে একসঙ্গে শহরে বেড়াতে যাই। ট্যাক্সি ভাড়াটা শেয়ার করা যাবে।

শেষ পর্যন্ত ওর সাথে পোষালো না। বেচারা দক্ষিণ আফ্রিকায় ডাক্তারি পড়ে। ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছে। পকেটের অবস্থা তেমন ভালো না। ট্যাক্সি ভাড়া নিয়ে ওর দর কষাকষির ধরন দেখে বিষয়টা ট্যুরিস্ট কম্পানিগুলিও বুঝে ফেলেছে। তাই ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়লো আমাকে এন্টারটেইন করতে। ১০ হাজার কেনিয়ান শিলিং (৮০ শিলিংয়ে ১ ডলার) দিয়ে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলাম। ওর সঙ্গে চুক্তি হলো, চার ঘন্টায় ও আমাকে পুরো নাইরোবি শহর ঘুরে-ফিরে দেখাবে। আলেক্সান্ডারের মার্সিডিজ ছুটে চলেছে শহরের দিকে। দু'পাশে দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠ। আকাশ এখনো বেশ মেঘলা। সকাল সাতটা বাজে অথচ অন্ধকারের চাদরটা এখনো ঝুলে আছে ফসলের মাঠে। হঠাৎ হঠাৎ একদল গাভীর মতো ফসলের মাঠে চড়ে বেড়ানো মেঘেরা পথের ওপর বেরিকেড দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে। দাঁড়িয়ে পড়ছে আমাদের মার্সিডিজও। গতি মন্থর করে ধীরে ধীরে মেঘের বেরিকেড ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে আলেক্সান্ডারের মার্সিডিজ। বিমানবন্দর থেকে নাইরোবি শহর অনেক দূরে। প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার পথ। রাস্তা তেমন ভালো না। খানাখন্দে পড়ে মাঝে মাঝেই শূন্যে লাফিয়ে উঠছে গাড়ি।

১৯৬৩ সালের ১২ ডিসেম্বর ব্রিটিশ তাড়িয়ে স্বাধীনতা লাভ করে কেনিয়া। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কেনিয়ার জাতির পিতা দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট জুমো কেনিয়াত্তা। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত, আমৃত্যু তিনিই কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। দেশটির মোট জনসংখ্যা সাড়ে তিন কোটি, আয়তন পাঁচ লক্ষ তিরাশি হাজার বর্গকিলোমিটার। প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোক বাস করে মাত্র ৬০জন। আফ্রিকার অন্যান্য অংশের মতোই বিরল বসতির দেশ কেনিয়া। আগামী ১০০ বছরেও কেনিয়ার জনসংখ্যা তেমন বাড়ার সম্ভাবনা

নেই। কারণ এইডস এক ভয়ানক দানবরূপে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে কেনিয়ানদের। প্রতিদিনই বাড়ছে মৃত্যুহার। জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশ খ্রীস্টান, ৬ শতাংশ মুসলমান আর বাকীরা বিভিন্ন আদি ধর্মের অনুসারী। ৯৭ শতাংশ লোকই অফ্রিকার কালো মানুষ, বিভিন্ন এথনিক গ্রুপে বিভক্ত। তিন শতাংশ এশিয়ান ইমিগ্র্যান্ট, মূলত ভারতীয় এবং পাকিস্তানী। ইমিগ্র্যান্টরা বসবাস করে দেশের বড় তিনটি শহরে, নাইরোবি, মুম্বাসা এবং কিমুসুতে। পূর্বদিকে ভারত মহাসাগরের উপকূলে রয়েছে কেনিয়ার ৫৩৬ কিলোমিটার জলসীমান্ত। অন্য তিনদিকে ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, সুদান, তানজানিয়া এবং উগান্ডার সাথে রয়েছে ৩৪৭৭ কিলোমিটার স্থলসীমান্ত।

শহরে ঢুকবার মুখেই একটি চেকপোস্ট। আলেক্সান্ডার জানালো, ওরা আমার পাসপোর্ট দেখতে চাইতে পারে। ইদানিং প্রচুর অবৈধ ইমিগ্র্যান্ট আসছে এশিয়া থেকে। তাই এই কড়াকড়ি চেকিং ব্যবস্থা। গাড়ির গতি কমালো ড্রাইভার। ওরা গাড়ির ভেতরে একটু উঁকি দিয়ে ছেড়ে দিল। শহরে ঢুকেই আমার মনে হলো আমি বোধ হয় কোন একটি চিড়িয়াখানায় ঢুকে পড়েছি। রাস্তার দু'পাশে প্রকান্ড সব বৃক্ষের সারি। গাছের ডালে ডালে বসে আছে বিশাল আকৃতির একেকটা ধনেশ পাখি। ওরা কেউ কেউ ওদের হলুদ চঞ্চু ডানার আঁড়ালে গুঁজে পরম নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিচ্ছে। আবার কেউ এইমাত্র কোন জলাশয় থেকে তুলে আনা একটি মাছ শিশু পাখিটির মুখে তুলে দিচ্ছে। ওদের ডানায়, ওদের চোখে, পালকে, পায়ে, চঞ্চুতে নেই এতটুকু ভয়ের জড়তা। দু'একটি পাখি আবার ডানা মেলে দিয়ে নেমে এসেছে পথের ওপর। আর তখন গাড়িগুলো গতি কমাচ্ছে, পথচারীরা ওদেরকে পাশকাটিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। অন্যান্য আরো অনেক ছোট পাখিও গাছগুলিতে কলরবমূখর। আমি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা এইসব পাখি ধরে খাও না? ও বললো, তোমার কি মাথাখারাপ? সঙ্গে সঙ্গে জেলে নিয়ে যাবে। কেনিয়ার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন খুবই কড়া। আর আইনের প্রয়োগ তার চেয়েও বেশি কড়া। যেখানে গাছপালা একটু ঘন সেখানে মাটিতে পড়ে আছে দু'একটি মৃত পাখির শব। আর সারা শহরেই পাখির পালক ছড়ানো। আকেক্সান্ডারকে বললাম গাড়ি থামাও। গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতেই একটা বুনো গন্ধ এসে নাকে লাগলো। সেই গন্ধে পাখির বিষ্ঠা ও পালকের ঝাঁজ আছে বৈ-কি।

হাতির দাঁতের দুটি জায়েন্ট তোরণ পেরিয়ে শহরের অন্য প্রান্তে নিয়ে এলো আলেক্সান্ডার। এই শহরে হাতে গোনা কয়েকটি হাইরাইজ বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছি। আমাদের মতিঝিল কিংবা নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের মতো সারি সারি হাইরাইজ চোখে পড়ছে না। ম্যানহাটন, মতিঝিল, এমন কি আবিদজানের প্লাতুতে ঢুকলেই কিংবা দূর থেকে দেখলেই মনে হয় এটিই হলো এই শহরের প্রধান বাণিজ্যিক এলাকা। নাইরোবিতে আলাদা করে সেইরকম একটি বাণিজ্যিক এলাকা আমার চোখে পড়ছে না। এখন আমরা শহরের খানিকটা বাইরের অংশে। এই এলাকায় সারি সারি একই প্যাটার্নের একতলা/দোতলা বাড়ি। আলেক্সান্ডার জানালো, এটা হলো এশিয়ানদের এলাকা। এখানেই ইন্ডিয়ান-পাকিস্তানীরা থাকে। বলেই সে গাড়ি থামালো। দুজনেই গাড়ি থেকে নেমে এলাম। রাস্তায় রাস্তায় দলে দলে ইন্ডিয়ান-পাকিস্তানী লোকেরা হাঁটছে, উর্দু-হিন্দিতে কথা বলছে, শুভেচ্ছা বিনিময় করছে, কেউ কেউ এই সাত-সকালেই পান চিবুচ্ছে। কোনো কোনো বাড়ি থেকে হিন্দি গানের মেলোডি ভেসে আসছে। মনে হয় যেন ভারত কিংবা পাকিস্তানের কোনো টিপিক্যাল মহল্লায় ঢুকে পড়েছি।

এরপর ও আমাকে নিয়ে গেল শহরের সবচেয়ে বড় একটি মন্দিরে। এই বিদেশ-বিভুইয়ে নাইরোবি শহরের প্রাণকেন্দ্রে ইন্ডিয়ানরা এত বড় একটি মন্দির কমপ্লেক্স কি করে তৈরী করলো? বিস্ময়ে আমি অভিভূত। স্বামীনারায়ন মন্দির কমপ্লেক্সটি কেনিয়ার সবচেয়ে বড়তো বটেই আফ্রিকার মধ্যেও একটি অন্যতম সেরা মন্দির। স্বামীনারায়ন মন্দির নির্মাণের প্রাক্কালে স্থপতি এবং উদ্যোক্তারা ভারতের রাজস্থান,

কেরালাসহ বিভিন্ন প্রদেশের সব প্রসিদ্ধ মন্দির ঘুরে দেখেন যাতে একে ভারতের ট্রেডিশনাল সাংস্কৃতিক আদলে তৈরী করা যায়। এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় মন্দিরের পবিত্রতা নিশ্চিত করার জন্য গঙ্গা, নর্মদা, সবর্মতি, গোমতি, ঘেলা, নীল, ভিক্টোরিয়া লেক এবং ভারত মহাসাগরের জলের সমারোহ ঘটানো হয়। শুধু তাই না, ফাউন্ডেশনে বিছিয়ে দেয়া হয় ১৫১টি দেশের ধাতব মুদ্রা। রাজস্থানের ভাবমূর্তি প্রোজ্জল করে তোলার জন্য মন্দিরে ব্যবহার করা হয় শত শত কিলোমিটার দূরের পিন্ডবাদা গ্রাম থেকে বহন করে আনা হলুদ স্যান্ডস্টোন। ১৫০টি দেবদেবীর ভাস্কর্যে শোভিত স্বামীনারায়ন মন্দিরের রূপে এতোই মুগ্ধ হয়ে পড়েছি যে, কখন সময় গড়িয়ে প্লেনে চড়ার কাল সমাগত হয়েছে টেরই পাই নি। ফেরার পথে একটি পাহাড়ের ওপর গাড়ি থামালো আলেক্সান্ডার। এখান থেকে পুরো নাইরোবি শহরটা দেখা যায়। পাহাড়ের হাঁটুর কাছে একটা পার্ক। ওখানে চড়ে বেড়াচ্ছে হরিণ ও নানান বন্যপ্রাণী। পাশেই পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অফিস।

আবার ফিরে এলাম নাইরোবি এয়ারপোর্টে। এবার যাবার পালা। বিদায়ের আগে আলেক্সান্ডার আমাকে জিজ্ঞেস করলো, ভ্রমণ কেমন হয়েছে? আমি ওর মাতৃভাষা সোহাইলিতে বললাম, মুজুরি। এই শব্দটির অর্থ, মজা/সুন্দর/দারুণ এর যে কোনোটাই হয়। এই একটি সোহাইলি শব্দই আমি জানি। কাজে লাগিয়ে দিলাম। আলেক্সান্ডার হ্যান্ডশেক করার বদলে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করলো। ওর চোখ ছলছল করছে। বললো, তুমিতো দেখি আমার মাতৃভাষাটাও জানো। আগে বলো নি কেন? বুঝতে পারছি, এই একটি শব্দ আমাকে ওর কাছে অনেক সহজ করে তুলেছে। ও পকেট থেকে ওর কম্পানির একটা কার্ড বের করে উল্টো পিঠে নিজের নাম ঠিকানা লিখে দিয়ে বললো, এরপর নাইরোবি এলে আমাকে কল দিও। তোমার জন্য ২০% ডিসকাউন্ট। তুমিতো সোহাইলি জানো, এই জন্য।

মাতৃভাষার একটি শব্দ যেন একটি খোলা দরোজা। সেই দরোজা দিয়ে আমি ঢুকে পড়লাম এক কেনিয়ান যুবকের হৃদয়ে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
৭ জুলাই, ২০০৬